৩.১৪ ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া (Social Functions of Religion)

এখানে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। ধর্ম সমাজের দ্বারা সৃষ্টি। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে ধর্মের কিছু ইতিবাচক সামাজিক ক্রিয়া আছে। জনসন যেমন বলছেন যে সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করা, অর্থাৎ সামাজিক নক্সা বা বর্তমান সমাজকে রক্ষা করা (pattern maintenance) ধর্মের একটি মূল কাজ।

> The social functions of religion, both for the religious group itself and for the wider society, can be classified as contribution to pattern maintaintenance, tension management and integration." (Jonson 1986 : 459)

রেখাচিত্র-১

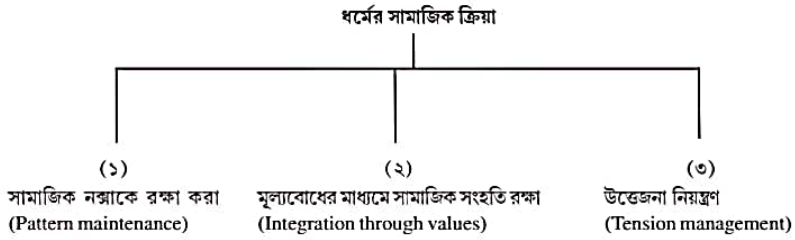

সূত্র ঃ জনসনের অনুসরণে করা (Jonson 1936 : 459)

কিন্তু আমার মনে হয় যে ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ক্রিয়া-দুটোকেই বুঝতে হবে। ইতিবাচক ক্রিয়া (functions) এবং নেতিবাচক ক্রিয়া বা দুস্ক্রিয়া (dysfunctions) -র মধ্যে প্রথম তফাৎ করেন রবার্ট মার্টিন। যেসব ক্রিয়া সামাজিক অভিযোজনের পক্ষে কাজ করে সেগুলি ইতিবাচক ক্রিয়া। যা অভিযোজনকে দুর্বল করে তা নেতিবাচক ক্রিয়া।

> "Functions are these observed sentiments which make for adoptation or adjustment of a given system ; and *dysfunctions*, those observed consequence which lessen the adoptation or adjustment of a system." (Merton, 1981 : 105)

এইবার আমরা ধর্মের সুক্রিয়া (functions) নিয়ে আলোচনা করব।

সামাজিক সংস্কৃতি রক্ষা : প্রথমতঃ ধর্ম সমাজকে সংহত করে। ধর্মগ্রন্থে অনেক উপদেশ আছে যা সমাজকে

সংহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাইবেলের 'Ten Commandments' এ চুরি করবার বিরুদ্ধে নিদান আছে। এই আদেশের ফলে একদিকে সমাজে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হল, আর অন্যদিকে চুরিবিদ্যা যে সামাজিক সংহতির পরিপন্থী তাও মনে করিয়ে দেয় (Jonson 1986 : 459)। Cult বা ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠীর কাছে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খ্যাঁ (Durkhein) লিখছেন যে, একমাত্র **ক্রিয়াতেই** সমাজের উপস্থিতি বোঝা যায় এবং ততক্ষণ সামাজিক ক্রিয়া হয় না যতক্ষণ না উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে ক্রিয়া না করে। একমাত্র একসঙ্গে ক্রিয়া করার ফলে ব্যক্তিবর্গ সামাজিকভাবে সচেতন হয় (Thompson 1989 : 127)। এই ক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্ম মানুষকে সংহত করে।

গ্রামীণ জাপানে ধর্ম :

গ্রামীণ জাপানে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন এমব্রি (Embree)। তাঁর মতে জাপানী ধর্মের মধ্যে দু'ধরনের আকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কৃষির সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি ধর্মীয় উৎসব ; দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তার ভিত্তি পূর্বপুরুষের উপাসনা।

সংহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাইবেলের 'Ten Commandments' এ চুরি করবার বিরুদ্ধে নিদান আছে। এই আদেশের ফলে একদিকে সমাজে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হল, আর অন্যদিকে চুরিবিদ্যা যে সামাজিক সংহতির পরিপন্থী তাও মনে করিয়ে দেয় (Jonson 1986 : 459)। Cult বা ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠীর কাছে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খ্যাঁ (Durkhein) লিখছেন যে, একমাত্র **ক্রিয়াতেই** সমাজের উপস্থিতি বোঝা যায় এবং ততক্ষণ সামাজিক ক্রিয়া হয় না যতক্ষণ না উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে ক্রিয়া না করে। একমাত্র একসঙ্গে ক্রিয়া করার ফলে ব্যক্তিবর্গ সামাজিকভাবে সচেতন হয় (Thompson 1989 : 127)। এই ক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্ম মানুষকে সংহত করে।

গ্রামীণ জাপানে ধর্ম :

গ্রামীণ জাপানে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন এমব্রি (Embree)। তাঁর মতে জাপানী ধর্মের মধ্যে দু'ধরনের আকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কৃষির সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি ধর্মীয় উৎসব ; দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তার ভিত্তি পূর্বপুরুষের উপাসনা।

ধর্মীয় জীবনের এই দুটি দিক কয়েকটি ক্রিয়া করে।

(১) যা সামাজিকভাবে মূল্যবান তার আচারভিত্তিক মূল্য দেওয়া :

(২) সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করা ;

(৩) ব্যক্তিকে—(ক) গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল করে তোলা— তার কর্তব্য পালনের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই নির্ভরশীলতা আনা হয়, (খ) একটা নিরাপত্তার চেতনা ব্যক্তির মধ্যে তৈরি করা ; এই চেতনা তৈরি হয় গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার মাধ্যমে। (Jonson 1986 : 459)

বাংলার দুর্গোৎসব : একই ধরনের ভূমিকা পালন করে বাংলার দুর্গোৎসব। জমিদারি প্রথার সময় থেকে দেখা যায় যে বাংলার দুর্গোৎসব একদিকে সাবেকি লোকশিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, আবার অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজকে সংহত করেছে। আজও দুর্গোৎসব শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি সামাজিক উৎসব। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৪ ৪৩-৪৬)। কিভাবে ধর্মের এই ক্রিয়া দেখানোর জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেব।

আমরা যদি মহালয়া থেকে শুরু করি তবে দেখব দুর্গোৎসবের আদিম ধর্মীয় উপাদান আছে। মহালয়া থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষ। মহালয়ার দিন পূর্বপুরুষকে স্মরণ করা হয়। প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কুমারনাথ ভট্টাচার্য্যের মতে, মহালয়ার সকালে লোকান্তরিত পিতৃপুরুষকেই নয়, পরিচিত বন্ধুস্বজন থেকে শুরু করে অপরিচিত এমনকি শত্রুদের জলদানে তৃপ্ত করাই তর্পণ। তাই যখন প্রবাহমান নদী জলে দাঁড়িয়ে দুহাতে জল

নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে যখন বলা হয় "ওঁ আগছন্ত মে পিতর ইমং গৃহন্ত্ব পোহাজ্ঞলিম" তখন সে শুধু যে পিতামহকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তা নয়, আমাদের পূর্বের যাবতীয় প্রাণকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৫ : ১৮)

23 of 93

দুর্গোৎসব (কৃষ্ণনগর)

নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে যখন বলা হয় "ওঁ আগছন্ত মে পিতর ইমং গৃহন্ত্ব পোহাঞ্জলিম" তখন সে শুধু যে পিতামহকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তা নয়, আমাদের পূর্বের যাবতীয় প্রাণকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৫ : ১৮)

দুর্গোৎসব (কৃষ্ণনগর)

চিত্র-৩ : রাজরাজেশ্বরী দূর্গামূর্তি, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি।

রাজ পরিবারের পুজোয় বিভিন্ন ধর্মের ও জাতের মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করত। যেমন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির রাজরাজেশ্বরীর পূজাতে সব শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারত। মুসলমান ঘরামীরা বাঁশ আনত। কুমোরেরা মূর্তি গড়তে। দেবীর চোখ, মুখ নাক আঁকত মুসলমান শিল্পীরা। পুজোয় পদ্মফুল আবশ্যক। তা সংগ্রহ করত বাগদি শ্রেণীর লোক। পুজোয় অনেক ফুল লাগে। মালিরা তা সংগ্রহ করত। কাঁধে করে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই কাজ করত সব শ্রেণীর লোকেরা। (রায় ২০১০ : ৩৫)

বর্তমানকালে বিভিন্ন বনেদি পরিবারের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরো দৃঢ় করে দুর্গোৎসব। যেমন বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বুদবুদের মানকরে রায়পুর বিশ্বাস বাড়ির পুজোতে ফি বছর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সদস্যরা ও আত্মীয়রা পুজোয় বাড়ি আসেন (মজুমদার ২০১৪ : ৪)। আবার পরিবারে-পরিবারে বৈরিতা দুর্গোৎসবের সময় মিটে যায়। যেমন কালনার বাদলা গ্রামে পোদ্দার বাড়ি ও হালদার বাড়ির মধ্যে ঝুট ঝামেলা লেগেই থাকত। কিন্তু সন্ধিপুজোর সময় এলেই দুই পরিবারের সদস্যেরা একে অপরকে কাছে টেনে নিতেন (ভট্টাচার্য ২০১৪)। অন্য ধর্মীয় উৎসব, যেমন ঈদ বা খ্রীস্টমাসেও মানুষে মানুষে মিলন দেখা যায়।

ঈদ উল ফিতর

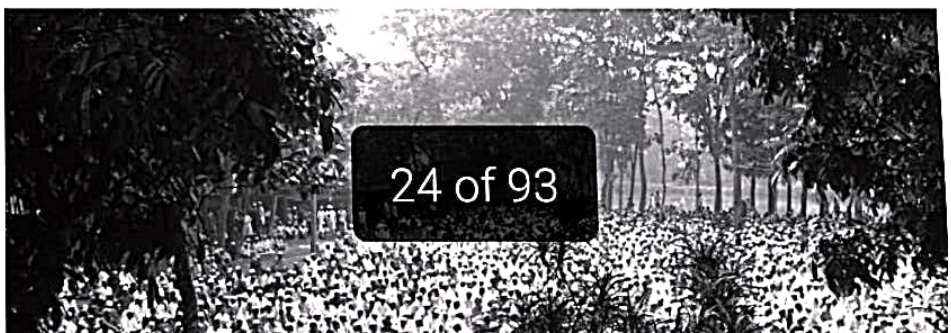

চিত্র-৪ : ঈদের প্রার্থনা

রমজান মাসে মুসমলানদের যেমন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি উপবাস করতে হয়। এও ধর্মের কৃচ্ছসাধন (disciplinary) ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। সন্ধ্যাবেলা যখন উপবাস ভাঙ্গা হয়, তখন মানুষ নানা সুখাদ্য গ্রহণ করে, একে ইফতার বলা হয়। রমজান ও ইফতারের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার প্রসার ঘটে ও কমিউনিটির (সামাজিক) বন্ধন সুদৃঢ় করাই এর লক্ষ্য। রমজানের শেষে আসে খুশীর ঈদ বা ঈদ-উল-ফিতার। এই ধর্মীয় উৎসবে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলন হয় এবং এই দিনটির এমনই মহিমা যে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকেও সবাই কাছে টেনে নেন।

২। মানুষের মনোবল বৃদ্ধি এবং উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ :

ধর্মের দ্বিতীয় ইতিবাচক কাজ হল মানুষের মনোবল বৃদ্ধি এবং উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুদ্ধবিভাগ থেকে একটি সমীক্ষা চালানো হয় সেনাদের মনোবলের উপর। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় "কঠিন সময়ে প্রার্থনা তোমার কতটা উপকারে লাগে?" প্যাসিফিক রণাঙ্গনের ৭০% উত্তরদাতা ও মেডিটারেনিয়ান রণাঙ্গনের ৮৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রার্থনা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে ২৮ থেকে

৬১ শতাংশ কিন্তু অন্য সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরা, এবং শত্রুর প্রতি ঘৃণাকেও প্রাধান্য দেয়। (Jonson 1986 : 463-4)। ফলে শুধুমাত্র প্রার্থনা সেনাদের যুদ্ধ করবার সময় মনোবল জোগায় না, যদিও প্রার্থনা যুদ্ধে মনোবল বাড়ানোয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

25 of 93

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি রক্ষা :

ধর্মের একটি বড় কাজ হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। জনসনের মতে "Religion not merely defines moral expectations of members of the religious group but usually enforces them." (Jonson : 464)

৬১ শতাংশ কিন্তু অন্য সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরা, এবং শত্রুর প্রতি ঘৃণাকেও প্রাধান্য দেয়। (Jonson 1986 : 463-4)। ফলে শুধুমাত্র প্রার্থনা সেনাদের যুদ্ধ করবার সময় মনোবল জোগায় না, যদিও প্রার্থনা যুদ্ধে মনোবল বাড়ানোয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি রক্ষা :

ধর্মের একটি বড় কাজ হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। জনসনের মতে "Religion not merely defines moral expectations of members of the religious group but usually enforces them." (Jonson : 464)

ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতা পরজন্মের ধারণা. ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এই নৈতিক অনুশাসনগুলির ধর্মের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। মানুষকে শেখানো হয় যে অমুক কাজ পুণ্য কাজ। আর অমুক কাজ পাপ কাজ। মুসলিমদের মধ্যে যেমন দরিদ্রদের অর্থদান করা পুণ্য কাজের মধ্যে পড়ে। এর ফলে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নরহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি কাজ সব ধর্মে পাপ কাজ হিসাবে স্বীকৃত। কারণ তা সামাজিক সুস্থিতির পরিপন্থী।

ধর্মীয় অনুশাসন মানুষকে সামাজিক সুস্থিতি রক্ষার্থে কাজ করতে উৎসাহ দেয়। সব ধর্ম ইহজন্ম এবং পরজন্মে মানুষকে ভাল কাজ করবার জন্য পুরস্কৃত করবার কথা হলে এবং সামাজিক অপরাধীদের ইহজন্ম ও পরজন্মে শাস্তির ভয় দেখায়।

৪। প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা :

ধর্মের চতুর্থ ইতিবাচক ক্রিয়া হল প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ, "Ethnography of Wilderness : The Sacred Groves in the Perception of the Khasi—Jaintia People", সজল নাগ দেখান যে সব প্রাচীন ধর্ম প্রথমদিকে প্রকৃতিকে পুজা করত। এবং এর ফলে পাহাড়, ঝরণা, জীবজন্তু ও গাছগাছালি রক্ষা করার দিকে মানুষ নজর দিত। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকৃতিকে মানুষ ধ্বংস করতে শুরু করে, যদিও সংগঠিত ধর্ম প্রকৃতি রক্ষা করবার কথা বলে।

ঋষিদের উপকথাতে আছে যে একসময় মানুষ ও জীবজন্তুরা মিলেমিশে থাকত। তাদের কবিরা এইযুগকে একটি স্বর্ণযুগের কথা বলেন। এখনও খাসি ধর্ম প্রকৃতি কেন্দ্রিক ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা ঋগিদের অন্যতম কর্তব্য।

> For the Khasis, nature is a holy sanctuary where god resides and continues to interact with man. Nature is seen as God's creation and another who nourishes human beings. The existence of sacred mountains, hills, rivers and sacred groves or sacred plants vindicates this fact. Hence Khasis treat nature with respect. They reveal a certain feeling of awe towards her. (Nag 2013-14 : 84)

এককথায় বলতে হলে খাষিদের কাছে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এক। তাই তারা প্রকৃতির লিলাতে মুগ্ধ। এবং ধর্মীয় অনুশাসনের ফলেই এখনও খাসিদের এলাকার মনোরম পরিবেশ এখনও নষ্ট হয় নি। (এমন একটি সুন্দর জায়গা হল মাফলাফ পবিত্র বন।

এইখানে আমরা ধর্মের চারটি ইতিবাচক ক্রিয়া নিয়ে আলোকপাত করলাম। প্রথমতঃ আমরা দেখলাম কীভাবে ধর্ম সমাজে সংহতি রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে আমরা জাপানে গ্রামীণ ধর্ম, বাংলার দুগোৎসব ও মুসলমানদের ঈদ অল ফিতরের মত ধর্মীয় উৎসবের অবদানের কথা আলোচনা করলাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখলাম কীভাবে ধর্ম মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে। যে সব মানুষ খুব চাপের মধ্যে কাজ করে, যেমন সেনারা, তারা ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধির উপায় খোঁজে। তৃতীয়তঃ ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণে একটা ভূমিকা পালন করে। চতুর্থতঃ ধর্মীয় ভাবনা পরিবেশ রক্ষা করবার ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

26 of 93

সমাজে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা :

সমাজে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবার পর এবার আসুন আমরা ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা, অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়া (dysfunction) নিয়ে আলোচনা করি।

এইখানে আমরা ধর্মের চারটি ইতিবাচক ক্রিয়া নিয়ে আলোকপাত করলাম। প্রথমতঃ আমরা দেখলাম কীভাবে ধর্ম সমাজে সংহতি রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে আমরা জাপানে গ্রামীণ ধর্ম, বাংলার দুর্গোৎসব ও মুসলমানদের ঈদ অল ফিতরের মত ধর্মীয় উৎসবের অবদানের কথা আলোচনা করলাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখলাম কীভাবে ধর্ম মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে। যে সব মানুষ খুব চাপের মধ্যে কাজ করে, যেমন সেনারা, তারা ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধির উপায় খোঁজে। তৃতীয়তঃ ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণে একটা ভূমিকা পালন করে। চতুর্থতঃ ধর্মীয় ভাবনা পরিবেশ রক্ষা করবার ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সমাজে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা :

সমাজে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবার পর এবার আসুন আমরা ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা, অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়া (dysfunction) নিয়ে আলোচনা করি।

ধর্ম একটি লোক ঠকানোর হাতিয়ার :

আদি যুগ থেকে বহু মনীষী বলেছেন যে ধর্ম একটি লোক ঠকানোর হাতিয়ার। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "প্রাচীন কাল থেকেই কোন কোন দুঃসাহসিক চিন্তানায়ক ধর্মকে যুক্তি বিরুদ্ধ, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায় এবং শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে ঘোষণা করেছেন" (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ : ১) এই দার্শনিকের মধ্যে ছিলেন আদিকালের ভারতে বৃহস্পতি এবং লোকায়ত দার্শনিকেরা। উনবিংশ শতকের দার্শনিক, কার্ল মার্কস ও এদের মধ্যে পড়েন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮)। মার্কস যেমন ধর্ম ও কুসংস্কারের মধ্যে কোন তফাত দেখেন নি। তিনি ধর্মকে 'জনগণের আফিম' আখ্যা দেন এবং সমাজে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা দেখিয়েছেন। কী কারণে ধর্মকে জনগণের আফিম বলব? তত্ত্বকথার মধ্যে না গিয়ে কিছু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝা যাবে। ২০১২ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করি। মুম্বাইয়ের ভিলে পার্লেতে একটি চার্চের বাহিরে দেখা গেল যে যীশুখ্রিস্টের মূর্তির পা বেয়ে জল পড়ছে। এই চরণামৃতকে নাকি সব অসুখ সারে। ফলে সেই 'পবিত্র' জল সংগ্রহ করবার জন্য জনগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এবার এই জলের গোপন উৎস খুঁজে বার করলেন Indian Rationalist Association এর সভাপতি সানাল এডামারুকু। তিনি দেখান যে পয়ঃপ্রণালীর ত্রুটির ফলে পাইপ থেকে নোংরা জল capillary action এর মাধ্যমে চুঁইয়ে পড়ছে যীশুর মূর্ত্তি থেকে। এই চরণামৃত খেলে রোগ সারা দুরস্ত, আরো নতুন ভয়ানক রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। তাঁদের বুজরুকি ধরা পড়েছে দেখে খ্রিস্টান পাদ্রিরা ভয়ানক চটে গেলেন। আর এড়ামারুকুকে চাপে রাখতে Catholic Christian Secular Forum তাঁর বিরুদ্ধে অধার্মীকতার অভিযোগ এনে মামলা করে। (Verma 2012 : 11) তারা অভিযোগ করে যে এডামারুকু তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন। অতএব তিনি গণশত্রু! দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল এই যে ধর্মের

চিত্র-৫ : সানাল এডামারুকু

ব্যবসায়ীদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে গিয়ে এডামারুকুকে দেশান্তরিত হতে হয়। (Tripathy & Matthew 2016 : 74) এর কারণ তিনি খুনের হুমকি পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাঁর প্রাণরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। এখন তিনি হেলসিঙ্কি তে থাকেন।

নারীর স্বাধীনতা দমন করবার অন্যতম হারিয়ার ধর্ম। দীয়া খাঁঃ ও মামালা ইউসুফজাইয়ের অভিজ্ঞতা।

যুগে যুগে ধর্মের নামে নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সব ধর্মের মৌলবাদীদের মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে। দীয়া খান নরওয়েতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন পাকিস্তানী ও মা আফগান। [illegible] গান বাজনায় শখ ছিল তাঁর। কিন্তু মুসলিম সমাজপতিরা মেয়েদের গান বাজনা করাকে 'হারাম' বলে মনে করত। দীয়া তাদের আপত্তি উপেক্ষা করে গান বাজনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে তাঁকে মুসলিম সমাজে কোপে পড়তে হয়। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে দীয়ার জীবন বিপন্ন হয়। বাধ্য হয়ে মাত্র সতের

ব্যবসায়ীদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে গিয়ে এডামারুকুকে দেশান্তরিত হতে হয়। (Tripathy & Matthew 2016 : 74) এর কারণ তিনি খুনের হুমকি পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাঁর প্রাণরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। এখন তিনি হেলমিঙ্কিতে থাকেন।

নারীর স্বাধীনতা দমন করবার অন্যতম হারিয়ার ধর্ম। দীয়া খাঁঃ ও মামালা ইউসুফজাইয়ের অভিজ্ঞতা।

যুগে যুগে ধর্মের নামে নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সব ধর্মের মৌলবাদীদের মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে। দীয়া খান নরওয়েতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন পাকিস্তানী ও মা আফগান। ছোটবেলা থেকে গান বাজনায় শখ ছিল তাঁর। কিন্তু মুসলিম সমাজপতিরা মেয়েদের গান বাজনা করাকে 'হারাম' বলে মনে করত। দীয়া তাদের আপত্তি উপেক্ষা করে গান বাজনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে তাঁকে মুসলিম সমাজে কোপে পড়তে হয়। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে, দীয়ার জীবন বিপন্ন হয়। বাধ্য হয়ে মাত্র সতের বছর বয়সে তাঁকে দেশান্তরিত হতে হয়। ইংলন্ডে গিয়ে তিনি নতুন জীবন গড়ার কথা ভাবেন। মুসলিম মহিলাদের জন্য sisterhood network.org নামে একটি website খোলেন যেখানে মেয়েরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত করতে পারবে—শিল্প, কবিতা, গান, আলোকচিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সেখানেও মুসলিম মৌলবাদীদের ক্রোধের কোপে পড়তে হয় দীয়া খানকে।

চিত্র-৬ : মালালা ইউসুফজাই

দীয়া খানকে আবার শুনতে হয় যে মুসলিম মেয়েদের শিল্প চর্চা 'হারাম'। কিন্তু দীয়া থেমে যাননি। তিনি একের পর এক সংগঠন গড়ে তোলেন। তার মধ্যে রয়েছে AVA Foundation। এই সংগঠন প্রান্তিক শিশু ও তরুণদের জন্য কাজ করে। এছাড়া দীয়া সম্মানহানি খুনের উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন।

দীয়ার মত অনেক মেয়েরই স্বাধীনতা মুসলিম মৌলবাদীরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছে। মালালা শুধু পড়তে চেয়েছিল। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সে মৌলবাদীদের কোপে পড়ে। তালিবানরা তাঁকে গুলি করে মারার চেষ্টা করে। এবং এই হত্যার চেষ্টা ধর্মের নামে, সংস্কারের নামে করা হয় (Yousufzai & Lamb 2013)।

দীয়া কিন্তু নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন। তাঁর কথায় : "I feel I won the lottery by being born to parents like mine and into a country like Norway". (Khan 2016 : 43)

কিন্তু সব মেয়েরা এত 'ভাগ্যবান' নয়। মুসলিম দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশে মেয়েদের স্বাধীনভাবে রাস্তাঘাটে হাঁটারই অধিকার নেই।

পাকিস্তানের মহিলা চালক : নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ

কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা পাল্টাচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি টাক্সি কোম্পানী লাহোর, ইসলামাবাদ এবং করাচিতে ব্যবসা শুরু করে। তারা মহিলা চালক নিয়োগ করছে। সাতজন মহিলা

কোম্পানীতে চালক হিসাবে যোগ দিয়েছেন (Reuters 2016)। এটি একটি রক্ষণশীল মুসলিম দেশের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহিলা ক্ষমতায়নের একটি নজির সৃষ্টি করল কারিম। মনে রাখার দরকার এখনো ইসলামের জন্মস্থান, সৌদি আরবে, মহিলাদের গাড়ি চালানোর অধিকার নেই।

(৩) ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে :

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি ধর্ম মানুষের মধ্যে সংহতি রক্ষা করে। কিন্তু ধর্মকে যদি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা হলে তা [illegible] পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। যেমন—ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা (communalism) ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে দুভাবে দেখা যায়—(১) পারি কমিউনের (Paris Commune) মত স্থানীয় গোষ্ঠীদের স্বশাসনের অধিকার সমর্থন অথবা (২) দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে তৈরি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (Mc Millan, 2003 : 96) । আমরা দ্বিতীয় সংজ্ঞাটা গ্রহণ করলাম। ফলে আমরা communalism বলতে

কোম্পানীতে চালক হিসাবে যোগ দিয়েছেন (Reuters 2016)। এটি একটি রক্ষণশীল মুসলিম দেশের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহিলা ক্ষমতায়নের একটি নজির সৃষ্টি করল কারিম। মনে রাখার দরকার এখনো ইসলামের জন্মস্থান, সৌদি আরবে, মহিলাদের গাড়ি চালানোর অধিকার নেই।

(৩) ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে :

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি ধর্ম মানুষের মধ্যে সংহতি রক্ষা করে। কিন্তু ধর্মকে যদি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা হলে তা সামাজিক সংস্কৃতির পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। যেমন—ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা (communalism) ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে দুভাবে দেখা যায়—(১) পারি কমিউনের (Paris Commune) মত স্থানীয় গোষ্ঠীদের স্বশাসনের অধিকার সমর্থন অথবা (২) দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে তৈরি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (Mc Millan, 2003 : 96) । আমরা দ্বিতীয় সংজ্ঞাটা গ্রহণ করলাম। ফলে আমরা communalism বলতে বুঝি : "the antagonisic polarization of politics between religious and ethnic groups, particularly conflict between Hindus and Muslims" (Macmillan 2003 : 96)

সাম্প্রদায়িকতার উৎস খুঁজতে গিয়ে বিপান চন্দ্র লেখেন যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ লুকিয়ে রয়েছে ইংরেজ আমলের অর্থনৈতিক নীতি এবং বর্তমান ভারতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে। (Chandra 2014 : 299) তিনি দেখান যে সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়াকে (petty bourgeis) ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গোটা বিংশশতকে আমরা লক্ষ করি যে আধুনিক শিল্পের অভাবে এবং আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির অভাবে এবং সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতি ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় মধ্যবিত্তদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে কিন্তু তা তখনকার উপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পরিণত না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয়। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় পরিচয় হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের পরিচয়। বিপান চন্দ্রের ভাষায় :

> The petty bourgeois identity and ego get tied up with the cow or *peepal* tree protection and music before a mosque ; protection of such supposed rights—a cow must not be sacrificed, a music procession before a mosque must become silent—was seen as a life and death question because it came to represent of symbolically the preservation or destruction of the petit bourgeois ego. (Chandra, 2014, 300).

এর ফলে 'শত্রু'র সংজ্ঞাই বদলে গেলো। আসল শত্রু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, স্তিমিত হয়ে গেল। 'শত্রু' হল অপর রা, যারা বিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক।

বিপান চন্দ্র দেখান যে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সংকটে মধ্যবিত্তের সামনে দু'ধরনের মতাদর্শ ছিল। একদিকে তারা অতি উৎসাহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করে যখন তাদের মনে হয় যে রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন আসন্ন। অন্যদিকে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বন্ধ থাকে তখন তাদের আন্দোলন ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে ও নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ঠিক রাখাটাই তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। 'শত্রু' তখন সেই গোষ্ঠী থাকে হঠাতে পারলে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কাজের জন্য প্রতিযোগিতাও সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। (Chandra 2014 : 304-30

ফলে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে 'ধর্মীয়' স্বার্থ কিছু নেই। রয়েছে ক্ষুদ্র বস্তুগত স্বার্থ।

> It is therefore not accidental that the communal struggle occured mostly over government jobs, educational concessions, etc., and the political positions in the legislative councils and municipal bodies which enabled control over them." (Chandra 2014 : 30)

29 of 93

এছাড়া মধ্যবিত্তরাই সমাজে ব্যক্তিগতভাবে উঠতে পারত কিংবা সামাজিকভাবে নেমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই উল্লম্ব সচলতা অন্য কোন শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব নয়।

বিপান চন্দ্র মনে করতেন যে মতাদর্শ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা আসল সমস্যা (অর্থনৈতিক অনটন, বেকারত্ব

ফলে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে 'ধর্মীয়' স্বার্থ কিছু নেই। রয়েছে ক্ষুদ্র বস্তুগত স্বার্থ।

> It is therefore not accidental that the communal struggle occured mostly over government jobs, educational concessions, etc., and the political positions in the legislative councils and municipal bodies which enabled control over them." (Chandra 2014 : 30)

এছাড়া মধ্যবিত্তরাই সমাজে ব্যক্তিগতভাবে উঠতে পারত কিংবা সামাজিকভাবে নেমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই উল্লম্ব সচলতা অন্য কোন শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব নয়।

বিপান চন্দ্র মনে করতেন যে মতাদর্শ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা আসল সমস্যা (অর্থনৈতিক অনটন, বেকারত্ব ইত্যাদি) ঠিক মত বোঝে নি। ফলে সমস্যার সঠিক সমাধানও দিতে পারে নি। ফলে সাম্প্রদায়িকতা আসলে মিথ্যা বা ভ্রান্ত চেতনা।

> "....communalism neither comprehended the problem correcty nor provided a correct solution—it represented a false consciousness." (Chandra 2014 : 304)

সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা কিভাবে তৈরি হয় :

কিভাবে এই মিথ্যা চেতনা তৈরি হয় তার একটা উদাহরণ দিলাম। গো রক্ষা আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে অনেক দিন ধরে চলছে। ১৮৯৩ সালে একটি গোরক্ষা বক্তৃতা হয়েছিল বাহরেতে। সেখানে একটি ছবিতে একটি গরুর মধ্যে সব হিন্দু দেবদেবী ছবি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সবাইকে গরু দুধ দেয়—হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলমান। তবে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হল এক ব্যক্তি, যে আধা মানব ও আধা দানব, সে গরুকে তরোয়াল দিয়ে বধ করতে উদ্যত হয়েছে। আর অন্যদিকে ধর্মরাজ এই নবরাক্ষসের কাছে আবেদন করছে যে সে যেন দয়াপরাবস হয়ে গরুটিকে না মারে। তখনকার ডেপুটি কমিশনার মনে করেছিলেন সে ওই দানবের ছবিটার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে অপমান করা হয়েছে (Pandey 2014 : 310)। এরকম নানাভাবে হিন্দুদের মধ্যে গোমাতা রক্ষা করবার জন্য আন্দোলন চালানো হয়। যারা গো হত্যা করে তাদেরকে দানব বা হিন্দু ধর্মের শত্রু হিসাবে দেখানো হয়। গো-রক্ষাই মুখ্য। আর সবই গৌণ (দারিদ্র্য বেকারত্ব, ইংরেজদের অত্যাচার, ইত্যাদি)। অর্থাৎ গো-রক্ষা হিন্দু সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে কেন সাম্প্রদায়িকতা মিথ্যা চেতনা।

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" কবিতায় যেমন কাজি নজরুল ইসলাম গাহিলেনঃ

' "হিন্দু না ওরা মুসলিম"?' ওই জিজ্ঞাসা কোন জন? কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র?' (ইসলাম, ১৪০২ : ৬৪)

তাঁর 'ভারত বিধাতা' কবিতায়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন :

> 'অহরহ তব আহবান প্রচারিত, শুনি তব উদার বানী হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক
> মুসলমান খ্রিস্টানী পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
> প্রেম হার হয় গাঁথা।
> জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা!' (ঠাকুর, ১৪০০ : ৭২৭)

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে মজ্জাগত বিদ্বেষকে পুঁজি করল একদল স্বার্থন্বেষী রাজনৈতিক নেতা। এবং তাদের জন্য মূলতঃ দেশ ভাগ হল। প্রাক্‌স্বাধীনতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১০ লক্ষ ভারতীয় নিহত হয়, ৭৫,০০০ মহিলা ধর্ষিতা হন (Bandyopadhyay 2004 : 460)। বাংলা এবং পঞ্জাব সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাই পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীরা সাম্প্রদায়িকতা বিষময় ফল কিছুতেই ভুলতে পারে নি।

খুশবন্ত সিং-এর উপন্যাস "Train to Pakistan", যা পরে চলচ্চিত্রায়িত হয়, বা সাম্প্রদায়িকালের বাংলা ছায়াছবি "রাজকাহিনী" তারই প্রমাণ।

কিন্তু দেশভাগ থেকে কি আমরা কিছু শিখেছি? ভারতের দাঙ্গার ইতিহাস যদি আমরা পড়ি তবে আমরা দেখব যে অষ্টাদশ শতক থেকে এই ধরনের দাঙ্গা লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতা আন্দোলনের সুফলকে অনেকটা মৃয়মান করে।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাদের [illegible] হয়। বিংশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনটে পর্যায় লক্ষ করা যায়—(১) ১৯৬৪-৭০, অর্থাৎ নেহেরু উত্তর যুগে ; (২) ১৯৮০-১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রীত্বে ; (৩) আশির দশকের শেষদিকে—যখন বাবরি মসজিদ নিয়ে গোটা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। (Basu 2014 : 327)। ভারতের রাজনীতির গৈরিকীকরণ চলছে। ভাজপা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাজনীতি ২১ শতকের ভারতে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা জিইয়ে রেখেছে। (Pramanik 2009)।